UTTAR PRASANGA
April 2019
Vol. 13, No. - 4
RNI No. WBBEN / 2007 / 21521
Postal Registration No. COB/05/2017-2019

উত্তর প্রসঙ্গ-র
কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা

Printed, Published Owner by : Debabrata Chaki, Dinhata Road, Cooch Behar - 736101
Printed At : Manju Printing Works, Takagachh, P.O. + Dist. - Cooch Behar.
60/-

ISSN 2348-2036

উত্তর প্রসঙ্গ

একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল

এপ্রিল ২০১৯

- প্রসঙ্গ কাশ্মীর : অতীত ও বর্তমান
- সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় রংপুরের জমিদার সমাজ : ফিরে দেখা
- বাংলার মতুয়া আন্দোলন ও ঠাকুরনগর প্রসঙ্গ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর
- কামতা কোচবিহার রাজ্যের রাজনৈতিক রূপরেখা : ১৬২০-১৭০০
- পটভূমি কোচবিহার বিস্মৃতপ্রায় উদ্বাস্তু ক্যাম্পের কথা
- উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা এবং দক্ষিণবঙ্গের গাজন
- উত্তরবঙ্গ ও অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলার লোকবাদ্যযন্ত্র
- হারিয়ে যাওয়া খেলার গল্প
- মহান মানুষ হরিপদ পাল

RNI No. WBBEN / 2007 / 21521
Postal Registration No. COB/05/2017-2019
ISSN 2348 - 2036

উত্তর প্রসঙ্গ

৫২

একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল

১০ বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল ২০১৯ ❑ ৩০/-

— ঃঃ সূচীপত্র ঃঃ —

প্রসঙ্গ কাশ্মীর ঃ অতীত ও বর্তমান
ইন্দ্রিতা হালদার -১

সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় রংপুরের জমিদার সমাজ ঃ ফিরে দেখা
ফুলচান বর্মন - ১১

বাংলার মতুয়া আন্দোলন ও ঠাকুরনগর প্রসঙ্গ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর
কানু হালদার - ২১

কামতা-কোচবিহার রাজ্যের রাজনৈতিক রূপরেখা ঃ ১৬২০-১৭০০
সুমনা দাস - ৩২

পটভূমি কোচবিহার বিস্মৃতপ্রায় উদ্বাস্তু ক্যাম্পের কথা
রাজর্ষি বিশ্বাস - ৩৯

উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা এবং দক্ষিণবঙ্গের গাজন
স্বামী গিরিশাত্মানন্দ - ৪৪

উত্তরবঙ্গ ও অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলার লোকবাদ্যযন্ত্র
দিলীপকুমার দে - ৫০

হারিয়ে যাওয়া খেলার গল্প
তপনজ্যোতিবিকাশ সেন - ৬০

মনের মানুষ হরিশ্চন্দ্র পাল
দীনেশ রায় - ৬৫

সম্পাদকীয় দপ্তর
১৮, দিনহাটা রোড (নরনারায়ণ রোড), নিউটাউন, কোচবিহার - ৭৩৬১০১, পঃ বঃ, ভারত
দূরভাষ / ফ্যাক্স : (০৩৫৮২) ২২৪১৬৬, মো : ৯৪৩৪০৮৩৯০৯
E-mail : uttarprasangacob@gmail.com
Pl. Visit : www.facebook.com/uttarprasangacob

—ঃঃ নিয়মাবলী ঃঃ—

- আমাদের ভাবনা বছরে চারটি ত্রৈ-মাসিক জার্নালসহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা।
- এছাড়াও ইংরাজী ভাষায় বছরে এক বা একাধিক জার্নাল প্রকাশ করাও আমাদের লক্ষ্য।
- জার্নালে আমন্ত্রণমূলক (*Invited*) লেখা ব্যতিত প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ, উত্তর পূর্ব ভারত ও তৎসংলগ্ন এলাকার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্য, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক স্বতঃপ্রদত্ত (*Contributory*) লেখা অগ্রাধিকার পাবে।
- স্বতঃপ্রদত্ত রচনার ক্ষেত্রে নকল রেখে রচনার মূল কপি সহ ৩ কপি পাঠাবেন। রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পিঠে, সারিকে অন্তত দেড় ইঞ্চি মার্জিন ছেড়ে পাঠাবেন। রচনার নীচে লেখকের নাম, ঠিকানা এবং দূরভাষ নম্বর থাকা বাঞ্ছনীয়।
- উত্তর প্রসঙ্গে প্রকাশের জন্য পাঠানো যে কোন লেখা সম্পাদনা করার অধিকার সম্পাদকমণ্ডলীর থাকবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবে না।
- 'উত্তর প্রসঙ্গে' প্রকাশিত যে কোন রচনা 'উত্তর প্রসঙ্গের' কোন সংকলন গ্রন্থে পুনঃমুদ্রণের অধিকার থাকবে।
- 'উত্তর প্রসঙ্গে' প্রকাশিত যে কোন রচনা বইপত্র পাঠালে তা অবশ্যই আলোচিত হবে।
- গ্রন্থ আলোচনা বিভাগে বইপত্র পাঠালে তা অবশ্যই আলোচিত হবে।
- প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত কাম্য।
- প্রকাশিত রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব, জার্নালের নয়।
- জার্নালের উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে কোন রকম পরামর্শ খোলা মনে গ্রহন করা হবে।

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, উত্তর প্রসঙ্গের নয়।

উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকার আপনজন, সম্পাদনা সহযোগী ও প্রতিনিধিবৃন্দ (লেখক-পাঠক-গ্রাহকের যোগসূত্র)।

কলকাতা ঃ সংঘমিত্রা রায় প্রযত্নে -'সন্তোষ কুমার রায় (২য় তল), ২২ জওহরলাল নেহেরু রোড, চৌরঙ্গী (নিউ মার্কেটের নিকট), কলকাতা - ৭০০০৮৭। ফোন ঃ ০৩৩-২২৪৯২২৯। **শিলিগুড়ি ঃ** প্রবীর বর্মন, বয়েজ হাইস্কুল, শিলিগুড়ি-১। পার্থসারথী দাস, শিলিগুড়ি কলেজ, শিলিগুড়ি -১। **রায়গঞ্জ ঃ** ড. বৃন্দাবন ঘোষ, বোগ্রাম, কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। **বালুরঘাট ঃ** সমিত ঘোষ, ঢাকা কলোনী, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর। **জলপাইগুড়ি ঃ** পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় মাতাদি পেট্রোল পাম্প, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি। **চ্যাংড়াবান্ধা ঃ** সুশান্ত গুহ, ষ্টেশনপাড়া, চ্যাংড়াবান্ধা, কোচবিহার। **মাথাভাঙ্গা ঃ** কমল সাহা, পশ্চিম পাড়া, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার। **হলদিবাড়ি ঃ** অনিন্দ্য গুহ, উত্তর পাড়া, হলদিবাড়ি, কোচবিহার। সঞ্জয় কর্মকার, পশ্চিম পাড়া, হলদিবাড়ি, কোচবিহার। **দিনহাটা ঃ** ভাস্কর দেব, ছোটাগুড়ি, কোচবিহার। **কোচবিহার ঃ** অমর চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনগর, কোচবিহার; মন্টু ঠাকুর চৌধুরী, রবীন্দ্রভবনের নিকট, কোচবিহার।

ঃ আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ঃ

শ্রী আনন্দজ্যোতি মজুমদার, শ্রী শিবেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রী সিদ্ধার্থ সরকার।

"উত্তর প্রসঙ্গ নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়"

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ঃ

৩০০ টাকা (৪টি ত্রৈ-মাসিক জার্নাল ডাকখরচ সহ), কুরিয়ারে নিতে গেলে সংখ্যা প্রতি ৩০ টাকা অতিরিক্ত

৪০০ টাকা (বিশেষ সংখ্যাসহ ৪টি ত্রৈ-মাসিক জার্নাল), কুরিয়ারে নিতে গেলে সংখ্যা প্রতি ৩০ টাকা অতিরিক্ত

আজীবন সদস্য চাঁদা ঃ ১০,০০০ টাকা

উত্তর প্রসঙ্গ থেকে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা / সংকলন গ্রন্থে গ্রাহকেরা ২৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ

সম্পাদক ঃ উত্তর প্রসঙ্গ, ১৮ দিনহাটা রোড, নিউটাউন, কোচবিহার - ৭৩৬১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রসঙ্গ কাশ্মীর ঃ অতীত ও বর্তমান

ইপ্সিতা হালদার

মোহময়ী কাশ্মীর, কবির কল্পনায় ভূস্বর্গ এখানেই, একমাত্র কাশ্মীরেই। কিন্তু কাশ্মীরের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে এর রাজনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক পালাবদলও সমান আকর্ষণীয়। ডোগরা রাজা গুলাম সিং ১৮৪৬ সালে অমৃতসর সন্ধির দৌলতে ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কাশ্মীর কিনে নিয়েছিলেন। তাঁরই বংশধর হরি সিং পরবর্তীকালে কাশ্মীরের রাজা হন। তিনি হিন্দু রাজা হলেও রাজ্যটির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মানুষ মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের। কাশ্মীরের বেশির ভাগ জমির মালিক ছিলেন হিন্দু পন্ডিতরা। এই তৎকালীন হিন্দু পন্ডিতদের বিরোধিতা করেই কাশ্মীরে তৈরি হয় মুসলিম কন্‌ফারেন্স, লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড গড়ে তোলা। এই মুসলিম কনফারেন্সই পরে ন্যাশনাল কনফারেন্স হয়। শেখ আবদুল্লা ছিলেন এই দলেরই নেতা। শেখ আব্দুল্লার বক্তব্য ছিল কাশ্মীরের হিন্দু রাজা অত্যাচারী তাই তিনি নয়া কাশ্মীরের দলিল পেশ করেন। এই দলিলের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বনির্ভরতা, জীবনের মানোন্নয়ন ও ব্যবহারমুখী উৎপাদন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ছিল জমিদারী প্রথার বিলোপ, চাষীর হাতে জমির অধিকার, শিল্পের জাতীয়করণ, একচেটিয়া প্রথার অবসান ইত্যাদি। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে যায় ১৯৪৭ এর ক্ষমতা হস্তান্তর।

সমস্যার সূত্রপাত

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে কাশ্মীর তখনো একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবেই স্বীকৃত ছিল ভারত বিভাজনের সময় কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন এবং ভারত বা পাকিস্তান কোনো রাষ্ট্রেই যোগদান করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু এর অব্যবহিত করে পাকিস্তানের একটি সংবাদ মাধ্যম প্রচার করে যে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা আশঙ্কিত হয়ে পামাতুন মোহমুদ নামে উপজাতি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ পাকিস্তানের আধা-সামরিক বাহিনীর দ্বারা সমর্থন লাভ করে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে এরা কাশ্মীর আক্রমণ করে। এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হিন্দু রাজা হরি সিং-এর ছিল না। তাই মহারাজা হরি সিং ভারতকে অনুরোধ জানান কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে। যদিও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তখনই সাহায্য করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেন, ভারতের এই সামরিক সাহায্যের পূর্বে কাশ্মীরকে ভারতে যোগদান করতে হবে। ১৯৪৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এবং কাশ্মীরে

রাজা হরি সিং-এর প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা পত্রটিকে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ্ অ্যাকসেশন নাম দেওয়া হয়। কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয় কিন্তু বলা হয় দ্বিতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা কাশ্মীর একটি পৃথক মর্যাদা ভোগ করবে। কাশ্মীরের এই স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি পরে সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাশ্মীর ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী হামলাদারদের কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করে। বেশ কয়েক সপ্তাহ সংঘাতের পর পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এই সংঘাত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এর বিরোধিতা করেন এবং বলেন কাশ্মীর হল একটি দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা এবং কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তিকরণ আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সমর্থনযোগ্য। পাকিস্তান দাবি করে কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম তাই পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি এর একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান। অন্যদিকে ভারত মনে করে যে কাশ্মীর চুক্তির মাধ্যমে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরের ২/৩ ভূখন্ড ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে যে সময় যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয় সেই সময় ১/৩ ভূখন্ড পাকিস্তান সমর্থিত হানাদারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল সেই অংশটি আজাদ কাশ্মীর নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তই থেকে যায়। দুই অংশের সীমানা নিয়ন্ত্রণ রেখা হিসাবে বিবেচিত হয়।

কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ ছিল এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি দুটি কারণে জরুরি ছিল। প্রথমতঃ কাশ্মীর ভূখন্ডে অধিকাংশ জমি হিন্দু ভূস্বামীদের দখলে ছিল এবং ঐসব ভূস্বামী ও কাশ্মিরী পন্ডিতদের জোরালো চাপ ছিল ভারতীয় নেতৃত্বের উপর। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের সেই কারণে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ভারতীয় রাষ্ট্রচরিত্রের ধর্মনিরপেক্ষতার দিকটিকে আরো শক্তিশালী করবে, এই বিশ্বাস ভারতীয় নেতাদের মনে দৃঢ়মূল ছিল। তৃতীয়তঃ চুক্তির কারণে ভারতভুক্তি হবার পর থেকে ভারতীয় নাগরিকরা কাশ্মীরকে নিজেদের রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অর্থাৎ একটি অঙ্গরাজ্য বলেই মনে করতেন। অন্যদিকে এর বিপরীত ধারণা পোষণ করত পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব। কাশ্মীরের মতো একটি মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ না দেয় তাহলে সেটা হবে পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রতি সবচেয়ে বড়ো আঘাত। কাশ্মীরের জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আব্দুল্লার কাছে বিষয়টির তাৎপর্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে বলেছিলেন এর ফলে একজন স্বৈরাচারী শাসক অর্থাৎ

রাজার হাত থেকে কাশ্মীরের জনসাধারণ রক্ষা পেল। তাছাড়া কাশ্মীর ভারতে যোগ দেবার ফলে ভারতের বিশাল বাজারের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত হলে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে একটি সুষ্ঠ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। এই কারণেই তিনি তাঁর দলের নতুন নামকরণ করেন ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স যার পেছনে হিন্দু ও মুসলিম উভয় গোষ্ঠীর সমর্থনই বজায় থাকে। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগদানের পর শেখ আব্দুল্লাকেই কাশ্মীরের জনপ্রিয় নেতার স্বীকৃতি দেয় সেখানকার জনসাধারণ। ১৯৫২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও শেখ আব্দুল্লার মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র ঘোষিত হয়। যা দিল্লী এগ্রিমেন্ট নামে পরিচিত।

১৯৫২ সালের ১লা আগষ্ট এই সমঝোতাপত্রটি অনুমোদিত হয় এবং সদর-ই-রিয়াসৎ হন ন্যাশনাল কনফারেন্স বিরোধী ভারতীয় নেতা করণ সিং। এর ফলে শেখ আব্দুল্লা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর এই মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করে মার্কিন সরকার। কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে রুশমুখী ভারত সরকারকে সমস্যায় ফেলার একটি পরিকল্পনা আমেরিকার ছিল। ১৯৪৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি মার্কিন কূটনীতি Warren Austin শেখ আব্দুল্লার সাথে দেখা করেন। পুনরায় ১৯৫৩ সালে মার্কিন কূটনীতিক Allai Stevenson শেখ আব্দুল্লার সাথে করতে আসেন। এই ঘটনাগুলিকেই ভারত সরকার শেখ আব্দুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে তুলে ধরে এবং ১৯৫৩ সালে শেখ আব্দুল্লাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে পাঠানো হয়।

এরপর বিভিন্ন সাংবিধানিক আইন পাশ করে ভারত সরকার কাশ্মীরের স্বতন্ত্র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৫৪ সালে কন্সটিটিউশন অর্ডার-এর মাধ্যমে বিচার বিভাগীয়, রাজস্ব বিভাগীয় ও যোগাযোগ সম্পর্কীয় বিষয়ে কাশ্মীরের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। ১৯৫৯ সালে কাশ্মীরকে ভারতীয় লোকগণনা আইনের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৯৬০ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে কাশ্মীরের সর্বোচ্চ আদালত বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের উপর ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৫ সালে ভারতের শ্রম আইন কাশ্মীরেও প্রযোজ্য হয়। ১৯৬৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে সদর-ই-রিয়াসৎ পদ লোপ করা হয় এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যপালকে কাশ্মীরের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে পরিণত করা হয়। ১৯৬৬ সাল থেকেই কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পদ ঘোষিত হয়। ১৯৭০ এর দশকে মাঝামাঝি সময় থেকে শেখ আব্দুল্লার রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের ফলে ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের সাথে ভারতীয় জাতীয় নেতাদের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে শেখ আব্দুল্লার একটি চুক্তি স্থাপিত হয় এবং তিনি কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অভিষিক্ত হন। ১৯৮২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফারুক আব্দুল্লা কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধি দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে ফারুখ আব্দুল্লাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় ও

গুলাম মহম্মদ শাহকে তাঁর জায়গায় বসানো হয়। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি একেও ক্ষমতা থেকে সরিয়ে কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন। এবং জগমোহনকে রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগ করেন। ১৯৮৭ সালে ফারুখ আব্দুল্লা পুনরায় কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পদ ফিরে পান।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের জন্ম

কাশ্মীরের স্বতন্ত্র মর্যাদা হ্রাস এবং কাশ্মীরকে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমাগত অস্থির রাজনীতির ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হ্রাস পায়। এর ফলে কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজ্যের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা সম্পর্কে একটি তিক্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাকিস্তানের ভারত বিরোধী নানা প্ররোচনার ফলে সেখানকার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী তিক্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এই মনোভাব থেকেই ১৯৮৭ সালে কাশ্মীরে একটি রাষ্ট্র বিরোধী সংগঠনের জন্ম হয়। ইয়াসিন মালিক, আব্দুল হামিদ, ইজাজ আহমেদ জার, মকবুল বাট প্রমুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট যা JKLF নামে পরিচিত। এই সংগঠনের হাত ধরেই কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ আরো বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কাশ্মীরে রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতির সন্ত্রাসবাদী ও ইসলামীয় চরিত্র অর্জনের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া ছিল। এই পরিস্থিতি পাকিস্তানপন্থী গোষ্ঠী সুকৌশলে কাজে লাগায়। কাশ্মীরে জামাত-ই-ইসলামি দলের একটি ভ্রাতৃপ্রতীম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন গুলাম-মহম্মদ-আহার ও সৈয়দ সাহাবুদ্দিন। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা জম্মু-কাশ্মীরে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ও সামরিক সরকার কাশ্মীরের ভারতবিরোধী আন্দোলনে মদত জোগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে কাশ্মীর জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। তিনটি স্তরে কাশ্মীরের রাজনীতি আন্তর্জাতিক কূটনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের মাধ্যমে পাক-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে আরবের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক সহায়তায় অসংখ্য মাদ্রাসা স্থাপন হয়। দ্বিতীয় স্তরে এই মাদ্রাসাগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন কাশ্মিরী যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামী জিহাদি মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়, অন্যদিকে তেমনি অস্ত্রপ্রশিক্ষণেরও বন্দোবস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে তৎকালীন মার্কিন সরকারও সাহায্য করা শুরু করে কারণ এই অঞ্চল থেকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণকে সরিয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করা। তৃতীয় স্তরের যোগাযোগটি ছিল আফগানিস্তানকে নিয়ে। তখন সোভিয়েত বাহিনীর হাতে বিতাড়িত বহু আফগান গোষ্ঠী পাকিস্তানে এবং আজাদ কাশ্মীরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই আফগান গোষ্ঠীগুলিকেই মার্কিন মদতে পাকিস্তান সরকার কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির

সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করে। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে কাশ্মীরে ভারত বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার পেছনে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল আনসার-উল-ইসলাম, হিজাব-উল-মুজাহিদিন, হরকত-উল-জিহাদি ইসলামি, হরকত-উল-মুজাহিদিন। হরকত-উল-মুকাহিদিন কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অস্ত্রপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে এবং বিশেষ একটি যোদ্ধা গোষ্ঠী গঠন করে যারা লস্কর নামে পরিচিত। ১৯৯০ থেকে ৯৫ সালের মধ্যে এই লস্কর গোষ্ঠী পাকিস্তানের সামরিক শাসক বা সামরিক বাহিনীর মদতে Cross Border Terrorism এর জন্ম দেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় তীব্র পাকিস্তান বিরোধী জনমত তৈরি হয়, সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারার অবলুপ্তির দাবি ওঠে। ফলে কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ গড়ে ওঠার পেছনে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। কাশ্মীরের রাজনীতি পুনরায় তার গতিপথ পরিবর্তন করতে শুরু করে।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত যুদ্ধ

ভৌগোলিক দিক থেকেও কাশ্মীরের অবস্থান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। কারণ কাশ্মীর, চীন, আফগানিস্তান এবং পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সম্পর্কের যখন অবনতি ঘটে তখন চীন সম্পর্কে পাকিস্তান বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে। কাশ্মীর প্রশ্নে চীনও পাকিস্তানকে প্রথমে নৈতিক সমর্থন ও পড়ে ব্যাপক সামরিক সাহায্য প্রদান করে। এই সময় জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে ভারত একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। চীনা সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করবার জন্য নেহেরু চীনের সঙ্গে সংঘাতের পথ বেছে নেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে ভারতের পরাজয় একদিকে যেমন ভারতীয় বাহিনীর দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়, অন্যদিকে পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে। এর ফলে ১৯৬৫ সালে কচ্ছের রান অঞ্চল দিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং পাক-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে অবশ্য পাকিস্তান সফল হয়নি, বরং নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছুটা অঞ্চল ভারত দখল করে নিতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তান এই যুদ্ধের নাম দেয় Operation Gilaraltar. এর উদ্দেশ্য হল জম্মু কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানো। এই যুদ্ধ পাঁচ সপ্তাহ চলে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই যুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় দেখায়। অবশেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অনুসারে এই যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয় যা তাসকেন্ট ঘোষণাপত্র (Tashkent Declaration) নামে পরিচিত। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় —

ক) ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ শুরু হবার আগে, যে অবস্থানে ছিল সেখানে সরে যাবে।

খ) একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

গ) অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

ঘ) দুই দেশের নেতৃবৃন্দ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার ব্যাপারে কাজ করবে।

কিন্তু পুনরায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে এক রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের আন্দোলনে ভারত এগিয়ে আসে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পুনরায় একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রক্তাক্ত যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে ভারতের কাছে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ও বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের অর্থনীতি বিধ্বস্ত রূপ লাভ করে। ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান, বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি মেনে নেয়। এই যুদ্ধের পরাজয় পাকিস্তানীদের মনে এক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে। উগ্র ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে তারা কাশ্মীরে অস্থিরতা তৈরি করার কাজে পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে ভারত যখন তার প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায় তখন আবার নতুন করে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়। এইসময় আফগান মোজাহিদিন গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানের হাতে অর্পন করে। ১৯৮৩ সালে উভয় দেশের সম্পর্কের অগ্রগতির জন্য যৌথ কমিশন গঠিত হলেও সমস্যা তৈরি হয় যখন পাকিস্তান মোজাহিদিনদের কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। ১৯৯৮ সালের ১১ই মে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার পোখরানে দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারতের বক্তব্য ছিল প্রতিবেশি একটি রাষ্ট্র যখন নানাভাবে মার্কিন, বৃটেন ও চীনের ন্যায় রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হচ্ছে তখন ভারতকেও নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা একান্ত প্রয়োজনও। তবে ভারত কখনোই মারণাস্ত্রের প্রথম ব্যবহার করবে না।

কার্গিল যুদ্ধ

প্রত্যেক বছরের মতোই ১৯৯৮-৯৯ সালের শীতকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরের কার্গিল অঞ্চল খালি করে চলে যায়। এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে এবং দখল করে নেয়। ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘাত সূচিত হয়, যা কার্গিল সংঘাত নামে পরিচিত। ভারতীয় বায়ুসেনার সাহায্যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান দ্বারা দখলীকৃত

বেশ কিছু অঞ্চল পুনরায় দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে পাকিস্তান কার্গিলের অন্যান্য অঞ্চল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কার্গিল যুদ্ধ, কাশ্মীর সমস্যার দ্বিপাক্ষিক চরিত্রকে আবার আন্তর্জাতিক চরিত্রে রূপান্তরিত করেছে।

এছাড়া সিয়াচেন থেকে আরও উত্তরে কারাকোরাম পর্যন্ত এলাকা পাকিস্তানেই বলে পাকিস্তান দাবি করে, যা ভারত কখনোই মানেনি। তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই ১৯৮০র দশকের গোড়ায় তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক সিয়াচেনের ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ রেখা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হননি, বরং ১৯৮৪ সালের সংঘাতের সূত্রে ভারত Saltaro Rigdge দখল করে। সিয়াচেনের উপর তার কর্তৃত্ব বাড়িয়ে নেয়। তৎকালীন সেনা কমান্ডার পারভেজ মুশারফ ভারতীয় সেনাকে যেখান থেকে সরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অনেকে বলেন মুশারফ সেই ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতেই কার্গিল যুদ্ধের ছক কষেছিলেন। সম্প্রতি পারভেজ মুশারফ তাঁর আত্মজীবনী In the Line of Fire এ অবশ্য কার্গিল যুদ্ধের পেছনে তার ভূমিকা ছিল না উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই বক্তব্য নিয়ে নানা অভিমত সৃষ্টি হয়েছে।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ

স্বাধীনতার পর থেকেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে নানা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটেছে পাকিস্তানের মদতে। তবে ১৯৯০ সাল থেকে কাশ্মীরের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দ্বারা কাশ্মীরে এক সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এবং তার গুপ্তচর বাহিনী আই.এস.আই. পাকিস্তান কিন্তু বারবার তা অস্বীকার করেছে। তথাপি ভারত সরকার তথ্য প্রদান করে দেখিয়েছে যে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরেই অনেক জঙ্গি গোষ্ঠীর সদর কার্যালয়। সুতরাং এই ঘটনায় ভারত-পাক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়।

১) কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী মৌলানা মাসুদ আজহারকে মুক্ত করার জন্য কাঠমাণ্ডু থেকে নিউ দিল্লী আগত একটি যাত্রীবাহী বিমানকে ১৯৯৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ছিনতাই করা হয়। পরবর্তীকালে মুক্ত হয়ে এই মাসুদ আজহার কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালায়।

২) ২০০০ সালের ২২শে ডিসেম্বর লস্কর-এ-তৈবার সন্ত্রাসবাদীরা নয়া দিল্লীর Red Fort আক্রমণ করে।

৩) ২০০১ সালে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতীয় সংসদ আক্রমণ করে।

৪) ২০০২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জৈস-এ-মোহাম্মেদের দুজন সন্ত্রাসবাদী আহমেদাবাদের মন্দির আক্রমণ করে বহু মানুষ হত্যা করে।

৫) ২০০৩ সালের ২৫শে আগষ্ট মুম্বাইতে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের পেছনে লস্কর-এ-
তৈবার হাত আছে বলে ভারতীয় গুপ্তচর বাহিনী RAW-র আধিকারিকরা মন্তব্য করেন।
৬) ২০০৫ সালে ৬ই জুলাই লস্কর-এ-তৈবার ৬ জন সন্ত্রাসবাদী অযোধ্যার রাম মন্দির
আক্রমণের প্রয়াস গ্রহণ করে।
৭) ২০০৮ সালে ১০ জন সন্ত্রাসবাদী মুম্বাই আক্রমণ করে। ভারত এর পেছনে লস্কর-এ-
তৈবাকে দায়ী করে এবং প্রচুর প্রমাণ পেশ করে।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা মেটাবার প্রচেষ্টা

কার্গিল যুদ্ধের পর ২০০১ সালে আগ্রা সম্মেলনের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা
সমাধানের জন্য প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষত
দুটি দেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসক, কূটনীতিবিদ, প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের
পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
এই পদ্ধতিকে বলা হয় Truck Diplomacy। আগ্রা বৈঠকে ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নয়নের
ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হলেও মূল বিষয় বা Care Issue রূপে
কাশ্মীরই বাধার প্রাচীর তৈরি করে রেখেছে। ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে ইসলামাবাদে
অনুষ্ঠিত SAARC-এর শীর্ষ বৈঠকে সমঝোতার বাতাবরণ তৈরি হয়। রেল ও সড়ক
যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সফর, সাংস্কৃতিক বিনিময়, বন্দিমুক্তি
ইত্যাদি আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০০৪ এর ১৫ই জানুয়ারি অমৃতসর থেকে
লাহোরের মধ্যে ভারত-পাক সীমান্ত আতারিও পথে সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা চালু
হয়। ২০০৫ সালের ৭ই এপ্রিল শ্রীনগর ও মুজাফফরাবাদের মধ্যে বাস সংযোগ স্থাপিত
হয়। এর কয়েকদিনের মধ্যে ১৭ই এপ্রিল পাক রাষ্ট্রপতি মুশারফ ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচ
দর্শন করতে দিল্লী আসেন। এরপর ২০০৬ সালে পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ কাশ্মীর
সমস্যা সমাধানের জন্য সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন ভারতের অন্তর্গত
তিনটি অংশ যথাক্রমে শ্রীনগর, বারামুলা এবং কুপওয়ারা থেকে ভারত যদি সেনা অপসারণ
করে তাহলে পাকিস্তানও জঙ্গি ক্রিয়াকলাপ বন্ধের নিশ্চয়তা দিতে পারে। পাক রাষ্ট্রপতির
এই বক্তব্যে বাস্তবে এটাই প্রমাণিত হয় যে সীমান্তের সন্ত্রাসে পাকিস্তানের সক্রিয় ভূমিকা
আছে। পারভেজ মুশারফের পর একে একে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে বেনজির ভুট্টো,
ইউসুফ গিলানি। এরা প্রত্যেকেই আলাপ আলোচনার পথে চললেও নির্বাচনী রাজনীতিতে
নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকৃত প্রচেষ্টা কিছুই করেনি। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট
আসিফ আলি জারদারির কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখে মনে হয়েছিল হয়তো পাক-

ভারত সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হবে। কিন্তু এরপরই মুম্বাই সন্ত্রাস, ভারতের পক্ষে
প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের কড়া কূটনৈতিক সতর্ক বার্তা ডিমার্শ পাঠানো পুরো প্রক্রিয়াকে
থামিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের মাটিতে পুনরায় রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে
তেহেরিক-ই-ইনসাফের প্রধান প্রাক্তন ক্রিকেটার ইমরান খানের হাত ধরে। ইমরান খানের
উদ্যোগে দীর্ঘকাল ধরে আটকে থাকা কাশ্মীর সমস্যার জট আদৌ খুলবে কিনা সেদিকে
তাকিয়ে রয়েছেন দুই দেশের জনসাধারণ।

বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন
ভেঙে তৈরি হয়েছে অনেকগুলি দেশ। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বর্তমানে ভারতের
সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতেই আগ্রহী। ভারত একথা বারবার প্রমাণ করেছে যে
সীমান্তপারের সন্ত্রাস চালাচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীর হল একটি রাজনৈতিক
ইস্যু। নির্বাচনী বৈতরণী পার করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পাক রাজনৈতিক দলই কাশ্মীরকে
ব্যবহার করছে। অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত পাকিস্তানি নাগরিকদের দৃষ্টি অন্যপথে ঘুরিয়ে নিয়ে
যাবার জন্যই কাশ্মীরকে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্যাদার লড়াই হিসাবে। কিন্তু সাধারণ কাশ্মীরি
জনসাধারণ শান্তি চায়। সাধারণ পাক-ভারতীয় নাগরিকরাও শান্তি চান। কাশ্মীরের উপত্যকার
মানুষ উন্নয়নের গল্পে দীর্ঘদিনের হিংসা, রক্তপাত, জাতিদাঙ্গায় জর্জরিত উপত্যকার মানুষ
শান্তি চান, উন্নয়ন চান, পর্যটন ব্যবসার প্রসার চান। কাশ্মীরের অন্যতম ব্যবসা পর্যটনের
মাধ্যমে প্রচুর উন্নয়ন ঘটা সম্ভব। কাশ্মীরের উইলো কাঠের ক্রিকেট ব্যাট আন্তর্জাতিক মানের।
এখানকার শীতবস্ত্র, কার্পেট শিল্প, স্থানীয় হাতের কাজ প্রস্তুত কিরান আন্তর্জাতিক মানের।
আপেল, চেরি, স্ট্রবেরি প্রভৃতি রপ্তানির মাধ্যমেও ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করা সম্ভব।
কিন্তু সবার আগে দরকার শান্তি। উপত্যকায় গোলা-বারুদের গন্ধ মিলিয়ে গেলে তবেই
উন্নয়ন সম্ভব। ভারত সরকার আন্তরিকভাবে কাশ্মীরের উন্নয়নে সচেষ্ট। মানব উন্নয়নের
সূচকের ভিত্তিতে দুটি দেশের অবস্থানে খুব বেশি পার্থক্য নেই। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক একটি
সমীক্ষায় দেখা যায় যে ১৭৫টি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৭, পাকিস্তানের ১৪১।
গড়পরতা মাথা পিছু আয় ভারতে ৪৫০ ডলার, পাকিস্তানের ৪০ ডলার। সুতরাং বিদ্বেষ
দূর করে সহযোগিতার সম্পর্কের মাধ্যমে দুটি রাষ্ট্রই যে সমৃদ্ধ হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।
নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতির কূটনৈতিক প্রয়াস এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক-সামরিক কৌশলের
কারণে আমরা লক্ষ্য করছি যে বর্তমানে পাকিস্তান ভারত সম্পর্কে তার অবস্থান ও মূল্যায়ণ
নতুনভাবে করতে চাইছে। তাই আমরা আশা রাখি মৌলবাদের অবসান হোক, জঙ্গি কার্যকলাপ
বন্ধ হোক, কাশ্মীরে শান্তি স্থাপিত হোক। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে
শান্তির পক্ষে। অমরনাথ যাত্রাপথে আমরা দেখেছি তীর্থযাত্রী বহু হিন্দু যাত্রীদের স্থানীয়
মুসলিম যুবকরা সাহায্য করছেন নানাভাবে। সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের এমন উদাহরণের ছবি

কাটরা থেকে বৈষ্ণদেবীর মন্দির অবধি সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে ক
রক্তক্ষয় হয়েছে। তাই সময় এসেছে শান্তি স্থাপনের। ভারত বরাবরই পঞ্চশীল নীতি মেনে
শান্তির পক্ষে। তবে পাকিস্তানকেও আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে কঠোর হাতে
দমন করতে হবে। পাকিস্তান তার অর্থনীতির পুনরুদ্ধার তখনই করতে পারবে যখন ভারতসহ
অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করতে পারবে। দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ
সদর্থক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের পথে হাঁটলে কোনো এক অদূর ভবিষ্যতে হয়তো প্রকৃতির
অকৃপন আশীর্বাদে সমৃদ্ধ কাশ্মীর আবার মর্ত্যের ভূস্বর্গ হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র : —

1) Times of India, 10th April, 2009, Kolkata.

2) Victoria Schofield, Kashmit in Conflict : India, Pakistan and the Unending
Warm, I.B. Taurls and Co. Ltd. London, 2003.

3) Sumit Ganguly (ed), India's Foreign Policy : Retrospect and Prospect
Oxford University Press, 2010.

4) Horsh V. Pant, Indian Foreign Policy in a Unipolar World, Routledg
India, 2009.

5) David M. Malone, Does the Elephant Dance? Contemporary Indian For
eign Policy, Oxford University Press 2011.

6) J.N. Dixit, India - Pakistan in War and Peace, Books Today, New Delh
2002.

7) Jayantanuja Bandopadhyay, The Making of India's Foreign Policy, Allie
Publishers, New Delhi, 1980.

8) K. Santhanam, Jihadis in Jammu and Kashmir - An Article, The State
man, 10th January, 2016.

—:: —

সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায়

রংপুরের জমিদার সমাজ : ফিরে দেখা

ফুলচান বর্মন

(এক)

আলোচনার অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে প্রবন্ধের শিরোনাম ও প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঋদ্ধ পাঠকবর্গের নিকট দু-চার কথা তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করছি। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের কলকাতা ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র। আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত নব্য জমিদারশ্রেণী কলকাতাকে আবাসভূমি হিসাবে বেছে নেয়। উদ্ভব ঘটে মধ্যবিত্ত বাবু শ্রেণীর। কলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার সেখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নব জোয়ার নিয়ে আসে। উৎপত্তি ঘটে সারস্বত সমাজ বা বিদ্বৎ সমাজের। প্রবন্ধের বিষয় বেছে নিয়েছি ঔপনিবেশিক রংপুর জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি। বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় রংপুরের জমিদার সমাজ : ফিরে দেখা। কিভাবে রংপুরে বিদ্বৎ সমাজের উৎপত্তি ঘটলো, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু হল ও জমিদার সমাজের তাতে কি অবদান ছিল, সে সব বিষয় এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেছি। কলকাতা থেকে বহুদূরে মফঃস্বল রংপুরে এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এক তাৎপর্যময় দিক।

প্রথমেই আসছি রংপুর ও এই অঞ্চলের জমিদার পরিবারগুলি প্রসঙ্গে। প্রথমেই বলে রাখি যে রংপুর বলতে এখানে বিভক্ত রংপুরের কথা বলা হয়নি। রংপুর বলতে এখানে কোচ, মুঘল ও ব্রিটিশ আমলের রংপুরকে ধরা হয়েছে। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অংশের ভাগিদার হলেও রংপুর ছিল প্রাচীন কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের অংশ।[১] বাংলা ছিল জমিদার দেশ এই প্রদেশের সব জেলাতেই ছিল জমিদারদের প্রাধান্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে রংপুরে ৭৫টি জমিদারীর কথা জানা যায় এবং এগুলির মধ্যে ২০-২৯টি জমিদারী ছিল কমবেশী সমপর্যায়ের। শিক্ষা-দীক্ষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি কার্যে তারা সদাই ছিল পরস্পরের পরিপূরক।[২] হান্টার সাহেব ৭৫ খানা জমিদার পরিবারের মধ্যে ১৮টি পরিবারকে উল্লেখ করার মতো বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] নিচে একটি সারণির মাধ্যমে এই ১৮টি জমিদার পরিবারের নাম, বর্ণ, স্থায়ী ও অনাবাসিক বাসিন্দা এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে দেখানোর চেষ্টা করলাম।